# তারুণ্যের ধ্রুবতারা শাহাদত চৌধুরী

## শাহরিয়ার কবির

শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় 'বিচিত্রা' প্রকাশের আগে, এমনকি মুক্তিযুদ্ধেরও আগে যখন সাংবাদিকতার নবিশি করছি সাপ্তাহিক 'ললনা'র পাতায়। '৬৮ সালে সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছি, মাসিক 'কচি ও কাঁচা'য় রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই'র উৎসাহে সহকারী সম্পাদক হিসেবে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ সবই করছি। শিল্পী হাশেম খান একদিন নিয়ে গেলেন সেগুন বাগিচায় সাপ্তাহিক 'ললনা'র অফিসে। 'ললনা'র সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদকের খণ্ডকালীন চাকরি মিলেছিল, এক'শ টাকা মাইনে। সেখানেই পরিচয় শাহাদত ভাই, নবী ভাই, বেবী মওদুদ আর আহমেদ নূরে আলমের সঙ্গে, যারা পরবর্তীকালে চিত্রকলা ও সাংবাদিকতার জগতে তারকাখ্যাতি অর্জন করেছেন।

'ললনা'র সহকর্মীদের ভেতর আরও ছিলেন ব্যবস্থাপক সম্পাদক মোহাম্মদ আখতার ও বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্মরত কবি সেলিনা পারভীন দুজনই শহীদ হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। 'ললনা'র আগে শাহাদত ভাই কাজ করেছেন দাদাভাই সম্পাদিত ছোটদের পত্রিকা মাসিক কচি ও কাঁচায়, সঙ্গী ছিলেন শিল্পী হাশেম খান, রফিকুন নবী ও লেখক মাহবুব তালুকদার। কী নিয়ে দাদাভাই'র সঙ্গে মতবিরোধ হওয়াতে তাঁরা তিনজনই 'কচি ও কাঁচা' ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। যাঁরা এই ত্রয়ীর 'কচি ও কাঁচা' দেখেছেন তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন ছোটদের জন্য এত আকর্ষণীয় আধুনিক পত্রিকা এর আগে ঢাকা কেন, কলকাতা থেকেও বেরোয়নি। সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ'-এর চেয়েও মনোলোভা ছিল শাহাদত ভাইদের 'কচি ও কাঁচা'। তাঁদের চলে যাওয়ার পর 'কচি ও কাঁচা' সেই জৌলুস ধরে রাখতে পারেনি।

> **'ললনা'য় কাজ করার সময় শুরু হয়েছিল উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। একুশে ফেব্রুয়ারির সময় রাস্তার আলপনা আঁকা, বিশাল ক্যানভাসে আন্দোলনের ছবি আঁকা তখন থেকেই চালু হয়েছিল আর্ট কলেজে এবং এসব কাজে শাহাদত ভাই'র ভূমিকা ছিল শিল্পীর চেয়ে বেশি সংগঠকের...**

শাহাদত ভাইরা যোগ দেয়ার আগে সাপ্তাহিক 'ললনা' নিতান্তই 'বেগম'-এর মতো একটি ঘরোয়া মেয়েলি পত্রিকা ছিল। বেগম-এর মতোই একজন মহিলার পাসপোর্ট ছবি থাকত 'ললনা'র প্রচ্ছদে। শাহাদত ভাই 'ললনা'য় ঢুকেছেন সহকারী সম্পাদক হিসেবে, শ'দেড়েকের মতো মাইনে পেতেন, বেশির ভাগ খরচ হতো বই কেনায়। শুধু বই নয়, প্রচুর ইংরেজি সাময়িকী কিনতেন 'ললনা' অফিসের কিছু দূরে হাশেম মিয়ার পুরনো বইয়ের দোকান থেকে। বই কেনা ছাড়া অন্য কোন বিলাসিতা তখন তাঁর ছিল না। সিগারেটের ব্র্যান্ড ছিল কড়া 'কিং স্টর্ক', সম্ভবত চার আনা ছিল দশটার প্যাকেট। পরতেন খদ্দরের লম্বা ঝুলওয়ালা পাঞ্জাবি ও পায়জামা। তখন পাঞ্জাবি পরা হত হাঁটুর ওপরে। শাহাদত ভাইর মতো লম্বা ঝুলের পায়জামা তখন আর কাউকে পরতে দেখিনি, যেটা এখন ফ্যাশন হিসেবে চালু হয়েছে।

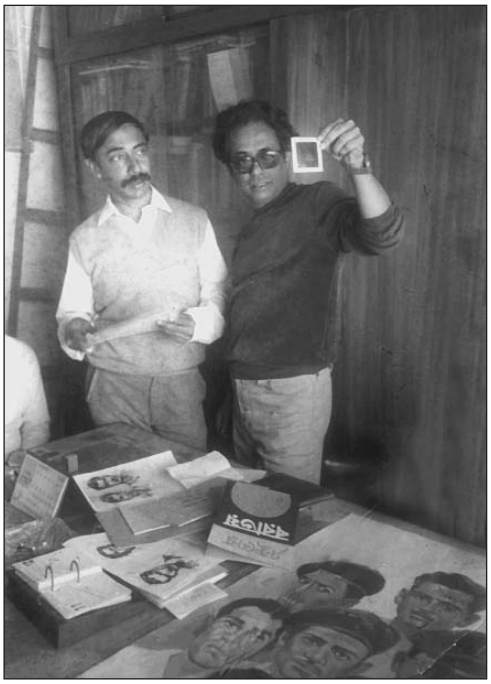

*বীরশ্রেষ্ঠদের ছবি হাতে শাহাদত চৌধুরী*

'ললনা'য় প্রথম প্রচ্ছদ কাহিনীর প্রচলন করেছিলেন শাহাদত ভাই, সম্ভবত 'কসমোপলিটন' থেকে ধারণা পেয়েছিলেন। 'ললনা'র আগে ঢাকা কেন, কলকাতার কোন সাময়িকীতেও প্রচ্ছদ কাহিনীর প্রচলন ছিল না। বিচিত্র বিষয় নিয়ে 'ললনা'য় প্রচ্ছদ কাহিনী প্রচলনের পর থেকে প্রচার সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে, রক্ষণশীলদের কপালে ভাঁজ পড়েছে, তারুণরা লুফে নিয়েছে। 'ললনা'র বেশির ভাগ প্রচ্ছদচিত্রের বৈচিত্র্য ও চমকে শাহাদাত ভাই'র মেধা, সৃজনশীলতা ও রসবোধের ছাপ রয়েছে। সেই সময় 'ললনা'র পুরো দলটি ছিল বামপন্থী, ছাত্র ইউনিয়ন

আর ন্যাপের সমর্থক। পশ্চিম পাকিস্তানের বামপন্থী ছাত্রনেতা তারেক আলী তখন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বির দ্ধে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে রূপকথার নায়কে পরিণত হয়েছেন। তারেক আলীর স্বাস্থ্যবান গোঁফ ছিল। মেয়েদের কাগজে ছেলেদের পচ্ছদে আনার সুযোগ ছিল না। শাহাদাত ভাই ঠিক করলেন পচ্ছদ কাহিনী হবে মেয়েরা ছেলেদের গোঁফ পছন্দ করে কি করে না। পচ্ছদের ছবি তিনি নিজেই তুলেছিলেন তারেক আলীর বিশাল গোঁফের নমুনা সামনে তুলে ধরে হাসছে সুন্দরী মডেল। পচ্ছদ কাহিনীও লিখেছিলেন তিনি। বহু বিখ্যাত নায়ক, রাজনীতিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের গোঁফের ছবি এঁকেছিলেন নবী ভাই নাকি হাশেম ভাই মনে নেই। বলাই বাহুল্য, পাঠক মহলে এই পচ্ছদ কাহিনী এমনই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, এ নিয়ে 'ললনা'য় এক বছর ধরে বিতর্ক ও লেখালেখি অব্যাহত ছিল। এরকম আরও অনেক তারুণ্যদীপ্ত পচ্ছদের কথা বলা যায় সেখানে তাঁর প্রতিভার প্রতিফলন ঘটেছে। মেয়েদের পত্রিকা হলেও 'ললনা'য় কোন মেয়েলিপনা ছিল না, যা বহু বছর পরে দেখেছি 'সানন্দা'য়।

প্রচ্ছদ কাহিনীর বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শাহাদত ভাইয়ের অসাধারণ মেধা ও সৃজনশীলতার পরিচয় ছড়িয়ে আছে পঁচিশ বছরের 'বিচিত্রা'য় এবং পরবর্তী পর্যায়ে 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এ, যার সূচনা ঘটেছে 'ললনা'পর্বে। তাঁর বয়স তখন পঁচিশের নিচে, অথচ ম্যাচিওরিটির বিচারে দশ বছর এগিয়ে। যে কারণে সেই সময় বেশির ভাগ বন্ধু ছিলেন তাঁর চেয়ে কয়েক বছরের বড়। ছাত্র ইউনিয়ন করতেন, বড়দা শহীদুল্লা কায়সারকে ভালভাবে চিনতেন। আমার অগ্রজ আলমগীর ছিলেন তাঁর ছোটবেলার বন্ধু।

আমি যখন জহির রায়হানের আগ্রহে তাঁর ইউনিটে ঢুকেছি সহকারী পরিচালক হিসেবে, শাহাদত ভাই একদিন বললেন, ছবির স্ক্রিপ্ট লিখবেন, মেজদার সঙ্গে পরিচিত হতে চান। একদিন নিয়ে গিয়েছিলাম মেজদার কাছে, তিনি তখন 'মনের মতো বউ' বানাচ্ছিলেন। ছবির চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারে মেজদার কাছ থেকে খুব একটা উৎসাহ পাননি বলে ব্যাটে-বলে এক হয়নি। তবে চিত্রজগৎ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল তখন থেকেই, যা শেষ পর্যন্ত ছিল। পাকিস্তান আমলে 'চিত্রিতা'র পাতায় এবং বাংলাদেশ আমলে 'আনন্দ বিচিত্রা'য় এর পরিচয় পাওয়া যাবে।

'ললনা'য় কাজ করার সময় শুরু হয়েছিল উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। একুশে ফেব্রুয়ারির সময় রাস্তার আলপনা আঁকা, বিশাল ক্যানভাসে আন্দোলনের ছবি আঁকা তখন থেকেই চালু হয়েছিল আর্ট কলেজে এবং এসব কাজে শাহাদত ভাই'র ভূমিকা ছিল শিল্পীর চেয়ে বেশি সংগঠকের। আর্ট কলেজ থেকে পাশ করলেও ছবি আঁকার চেয়ে তাঁর আগ্রহ

*শাহরিয়ার কবিরের বিয়েতে শাহাদত চৌধুরী ও সেলিনা চৌধুরীর বাঁয়ে, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, ডানে শা.চৌ'র বড় ভাবীও পেছনে ভাগ্নে মুনীর মে '৮১*

ছিল লেখালেখিতে। সেই সময় বেশ কিছু ছোট গল্প লিখেছিলেন তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্যের পাতায় এবং বিভিন্ন সাময়িকীতে।

ঊনসত্তরের ফেব্রুয়ারিতে একুশে সংকলন বের করতে হবে, পরিকল্পনার দায়িত্ব নিলেন শাহাদাত ভাই। তখন একুশ উপলক্ষে প্রচুর সংকলন বের তো যা এখন চোখে পড়ে না। শাহাদত ভাই ঠিক করলেন সামরিক শাসনবিরোধী রাজনৈতিক ছড়ার সংকলন বের করবেন। আমরা সবাই লেখা জোগাড়ের কাজে লেগে গেলাম। হাশেম খান আর রফিকুন নবী স্কেচ আর কার্টুন আঁকলেন। শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ থেকে আরম্ভ করে খ্যাতিমান কবিদের কারো লেখাই বাদ পড়েনি। ফর্মা সাজাতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে আধা পৃষ্ঠা খালি জায়গা বেরিয়ে পড়ল, ভরবার মতো কিছু নেই। আমাকেই ধরলেন তক্ষুনি আধাপৃষ্ঠার একটা ছড়া লিখে দিতে হবে। তখন সবেমাত্র গল্প/প্রবন্ধ লেখা শুর করেছি, ছড়া/কবিতার ধারে কাছেও ছিলাম না। শাহাদত ভাই কোন অজুহাত শুনলেন না, আমাকে দিয়ে ছড়া লিখিয়েই ছাড়লেন। আমার অপাঠ্য লেখাটি বাদ দিলে রাজনৈতিক ছড়ার এমন অসাধারণ সংকলন আজ অবধি চোখে পড়েনি।

'ললনা'র সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হতো ফওজিয়া সাত্তারের। তাঁদের বাড়ির প্রাঙ্গণেই ছিল টিনের চালের তিন কামরায় 'ললনা'র দফতর, আরেক দিকে প্রেস। ফওজিয়া সাত্তার অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। আমরা চাইতাম তিনি প্রতিদিন অফিসে এসে বসুন, কিন্তু আসতেন কদাচিৎ। প্রয়োজন হলে আখতার ভাইকে বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন। আখতার ভাই ছিলেন মালিক পক্ষের প্রতিনিধি, তবে শাহাদত ভাই'র প্রথাবিরোধী সকল কাজেই তাঁর প্রসন্ন সম্মতি ছিল। মাঝে মাঝে পুরানা পল্টনে তাঁর এ্যাপার্টমেন্টে আড্ডা বসত, পানাহারের যাবতীয় আয়োজনে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করতেন না। 'ললনা' পরিবারের বন্ধুরাও শরিক হতেন সেই আড্ডায়, যার মধ্যমণি ছিলেন শাহাদত ভাই। যে কোন আড্ডা অনায়াসে জমিয়ে রাখতেন তিনি।

'ললনা'র সাফল্যে উৎসাহী হয়ে মালিকপক্ষ 'সমীপেষু' নামে নতুন একটি সাহিত্য সংস্কৃতিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন। এ ক্ষেত্রে তখন গাজী শাহবুদ্দীন সম্পাদিত 'সচিত্র সন্ধানী' ছিল সবার শীর্ষে। শাহাদাত ভাই'র সঙ্গে পরামর্শ করে আখতার ভাই 'সমীপেষু'র সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্ব দিলেন আমাকে, বেতন দ্বিগুণ হলো, তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। নার্ভাস ছিলাম, শাহাদত ভাই অগ্রজ বন্ধু হিসেবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

সাময়িকী ছাপার ক্ষেত্রে তখনও আমরা লেটার প্রেসের যুগে। ঠিক হলো প্রায় দুশ পৃষ্ঠার পত্রিকার অন্ত ৩ ফর্মা অফসেটে ছাপা হবে। তখন এ ধরনের পত্রিকায় চার রঙের পচ্ছদ চালু হয়নি। আখতার ভাই ছাপার কাজে এক বিরল প্রতিভা ছিলেন। হাশেম ভাইর সঙ্গে বসে নতুন আইডিয়া উদ্ভাবন করতেন। তাঁর কাছেই শিখেছি অফসেটে তিন রঙ ব্যবহার করে কি ভাবে চার রঙের এফেক্ট আনা যায়। অফসেট ছাপা তখন খুবই ব্যয়বহুল ছিল।

শাহাদত ভাই 'ললনা'য় প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ছাড়াও প্রশ্নোত্তর বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। পাঠকরা বহু বিচিত্র প্রশ্ন পাঠাতেন। তাঁর উত্তর যেমন ছিল শাণিত, বুদ্ধিদীপ্ত একই সঙ্গে ছিল প্রখর কৌতুকবোধ যা পাঠকদের অনাবিল আনন্দ দিত। নিজেকে আড়ালে রাখবার জন্য 'ললনা' পর্বে তিনি শাহাদত চৌধুরী নাম সংক্ষেপ করে 'শাচৌ' হয়েছিলেন। বহু

পাঠকের কৌতূহল ছিল 'শাচৌ' ছেলে না মেয়ে। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়ে যেতেন। একবার এক নাছোড়বান্দা পাঠিকার প্রশ্নের জবাবে লিখলেন ধরে নিন শালা চৌকিদারের সংক্ষেপ হ ে ছ শাচৌ! শুধু বড় মাপের মানুষরাই পারেন নিজেকে নিয়ে কৌতুক করতে।

'ললনা'য় সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল শাচৌর প্রশ্নোত্তর বিভাগ। শাচৌর জনপ্রিয়তার সুযোগ 'সমীপেষু'তেও নিয়েছিলাম। এক বছর পর সেবা প্রকাশনীর কাজী আনোয়ার হোসেন যখন আমাকে 'রহস্য পত্রিকা' সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেখানেও শাচৌর অবাধ বিচরণ ছিল। পচ্ছদ পরিকল্পনা আর প্রশ্নোত্তর বিভাগ পরিচালনায় তখন তাঁর কোন জুড়ি ছিল না।

'সমীপেষু' বের করবার সময় আমাদের সামনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল গাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদের 'সচিত্র সন্ধানী'। সৈয়দ শামসুল হক, জহির রায়হান, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ও মুর্তজা বশীর সহ দেশের সেরা লেখকরা সন্ধানীর নিয়মিত লেখক। কাইয়ুম চৌধুরীর মতো শিল্পী ছিলেন শিল্প নির্দেশক, গ্রাফিকস-এ যাঁর জুড়ি গত চল্লিশ বছরেও মেলেনি। আমরা জোর দিলাম চমক সৃষ্টির ওপর। সন্ধানীর পচ্ছদে থাকত চিত্রনায়িকাদের ছবি, পেছনের পচ্ছদে বিজ্ঞাপন। চিত্রনায়িকার ছবি ছাড়া এ ধরনের পত্রিকা তখন ভাবা যেত না। শাহাদত ভাই বললেন, 'সমীপেষু'র প্রথম বছর শেষ পচ্ছদে কোন বিজ্ঞাপন নেয়া হবে না, তিনি প্রথম পচ্ছদের মতো শেষ পচ্ছদও ব্যবহার করবেন। ঠিক করলেন একজন নায়িকার একই ভঙ্গির দুটি ছবি তিনি তুলবেন একটি সামনে থেকে, অপরটি পেছন থেকে। প্রথম পচ্ছদে ছাপা হবে সামনের ছবি, শেষ প্রচ্ছদের পেছনের ছবি। প্রথমে সন্দেহ ছিল। ছবি যখন তুলে আনলেন তখন মানতেই হলো শাহাদাত ভাইর কোন তুলনা নেই। 'সমীপেষু'তে আমি এক বছর কাজ করেছি। এক বছরের ভেতরই 'সমীপেষু' পাঠকপ্রিয়তার পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতির সমালোচকদেরও প্রশংসা অর্জন করেছিল। জহির রায়হান, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, মাহমুদুল হক, সুচরিত চৌধুরীসহ রিজিয়া রহমান ও তখনকার খ্যাতিমান সব লেখকই 'সমীপেষু'তে লিখেছেন।

সত্তর সালে কাজী আনোয়ার হোসেন যখন 'রহস্য পত্রিকা' বের করেন আমি 'ললনা' গ্র প ছেড়ে সেবা গ্রুপ যোগ দিই। একই সময় শাহাদত ভাইও 'ললনা' ছেড়ে ফজল শাহাবুদ্দীন ও লায়লা সামাদের 'চিত্রিতা'য় যোগ দেন। 'চিত্রিতা' ছিল সম্পূর্ণ অফসেটে ছাপা, পচ্ছদে ও ভেতরে চার রঙা ছবিসহ এক চোখ ধাঁধানো পাক্ষিক। 'ললনা' ছেড়ে 'চিত্রিতা'য় যোগ দেয়ার পর শাহাদত ভাইর অসাধারণ মেধা প্রকাশের সুযোগ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর দুই শিল্পীবন্ধু হাশেম খান ও

*বিচিত্রায় সম্পদকীয় কক্ষে শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে কবি সাইয়িদ আতিকউল্লাহ ও আমি*

রফিকুন নবীও 'চিত্রিতা'র মাধ্যমে গ্রাফিক্স-এর জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

'চিত্রিতা' অফসেটে ছাপা হতো, লেটার প্রেসে আর্টপুল তুলে প্রতিটি পাতা এক এক লাইন কেটে সাঁটা হতো গ্রাফিকস্-এর চাহিদা অনুযায়ী। তখন কম্পিউটার ছিল না, বহুবিচিত্র বাংলা টাইপোগ্রাফি ছিল না, আরও অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল, যার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন 'চিত্রিতা'র পাতায় ছিল না। এ পত্রিকা হাতে নিলে যে কারও মনে হবে অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ নৈপুণ্যে চিত্রিতা যুগ সৃষ্টি নয়, যুগ অতিক্রম করেছিল।

সম্পাদক হিসেবে শাহাদত চৌধুরী নিজে কখনও কর্মবিভাজন মানেননি, সহকর্মীদেরও তা মানতে নির ৎসাহিত করেছেন। সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি প্রতিবেদন লিখতেন, ছবি তুলতেন, শিল্প সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি যখন 'চিত্রিতা'য় ফুল টাইমার আমি তখন রহস্য পত্রিকায়। সময় পেলেই চলে আসতেন কাজী আনোয়ার হোসেনের দফতরে। তুমুল আড্ডা হতো। এরই ফাঁকে আমি কাজের কথা সেরে নিতাম। সেই সময় মাসুদ রানা সিরিজের কয়েকটি বইও তিনি আনোয়ার ভাইকে লিখে দিয়েছিলেন অর্থের প্রয়োজনে। হাসান উৎপল ছদ্মনামে তাঁর একটি উপন্যাসও সেবা প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছিল। রহস্য পত্রিকার গতানুগতিক চরিত্র ভাঙার জন্য একবার পচ্ছদের বিষয় নির্বাচন করেছি 'শিল্পের রহস্য'। এ বিষয়ে লেখার জন্য শাহাদত চৌধুরীর চেয়ে যোগ্য কাউকে তখন মনে হয়নি। শাহাদত ভাই প্রচ্ছদে ব্যবহার করলেন সালভাদর দালির একটি পরাবাস্তববাদী ছবি। লেখা শুরু করেছিলেন জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে। সমচরিত্রের অন্য কোন বাংলা কিংবা ভিন্নভাষী পত্রিকায় এ ধরনের প্রচ্ছদ ও বিষয় এখনও ভাবা যায় না।

তাঁর পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যারা পরিচিত তারা জানেন অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে লিখতেন তিনি। অনেক সময় মনে হবে বাক্য অসম্পূর্ণ, ক্রিয়াপদ প্রায়ই অনুপস্থিত। বিচিত্রাপর্বে তাঁর লেখা সংশোধনের কাজ ছিল কখনও আমার, কখনও সাযযাদ কাদিরের। কখনও তিনি যদি নিজের অসংশোধিত লেখার প্র ফ দেখতেন খুব বিরক্ত হতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, পাণ্ডুলিপির এই বেহাল অবস্থার জন্য দায়ী হচ্ছে চিন্তার দ্রুততার সঙ্গে তাঁর কলমের পাল্লা দিতে না পারা।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সাংবাদিকতার জগতে শাহাদত চৌধুরীর হাতেখড়ি ঘটেছে ইত্তেফাকের পাতায়। যতদূর মনে পড়ে ইত্তেফাকে প্রকাশিত তাঁর প্রথম খবরটি ছিল আর্ট কলেজে কুকুরের দৌরাত্ম্যের ওপর। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বার্তা সম্পাদক সিরাজউদ্দিন হোসেনের অত্যন্ত, স্নেহভাজন ছিলেন তিনি। শাহাদত ভাই গর্ব করে বলতেন তাঁর সাংবাদিক জীবনের প্রথম খবরটি ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল। সিরাজ ভাই শিরোনাম দিয়েছিলেন 'সারময় সমাচার।' তখন তাঁর বয়স একুশ/বাইশের বেশি হবে না। এর দু/তিন বছর পর আরম্ভ হয়েছে 'ললনা'পর্ব। সেটাও প্রাথমিক প্রস্তুতির কাল। এই প্রস্তুতি পর্বেই আমরা 'বিচিত্রা' ও 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এর সম্পাদকের সৃজনশীলতা, মেধা ও দক্ষতার পরিচয় পেয়েছি। তিনি ছিলেন তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের বিরুদ্ধে নিজে লড়াই করেছেন। কখনও জয়ী হয়েছেন, কখনও পরাজয় মেনে নিয়েছেন। আবার নতুনভাবে লড়াই করেছেন। লড়ে গেছেন আমৃত্যু।

'৭২ সালে রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসার পর কবি ও সম্পাদক ফজল শাহাবুদ্দীন তাঁকে দৈনিক বাংলায় এনে বিচিত্রার ভার তাঁর কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন। 'বিচিত্রা'র সামনে তখন

কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, অনুকরণযোগ্য উদাহরণও ছিল না। অচেনা এক দুর্গম পথে তিনি যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন আমাদের মতো কিছু অনভিজ্ঞ সহযোগী সঙ্গে নিয়ে। আমাদের চারপাশে তখন তারকা সাংবাদিক অনেকে ছিলেন। দৈনিক বাংলা ভবন ছিল তারকার মেলা। শাহাদত চৌধুরী নতুনদের নিয়ে কাজ করতেন। অনেক অচেনা তর ণকে তারকার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তারুণ্যের সংস্কারবিরোধিতা ও দ্রোহ ছিল তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত। বিচিত্রার বিজ্ঞাপনের জন্য তিনি একটি চমকপ্রদ বাক্য ব্যবহার করতেন 'সংস্কারমুক্ত না হলে বিচিত্রা পড়বেন না'। অনেক তারার রাজ্যে দিশাহীন তর ণদের কাছে তিনি ছিলেন ধ্রুবতারা। গত বছর তাঁকে বলেছিলাম স্মৃতিকথা লেখার জন্য, অন্তত পক্ষে বিচিত্রাপর্ব। তিনি এড়িয়ে গেছেন, বলেছেন আমাকে লেখার জন্য। তাঁকে বলেছিলাম বিচিত্রার ইতিহাস তিনি ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবেন না। তিনি কোন কথা বলেননি। পরে শুনেছি তিনি স্মৃতিকথা লেখা আরম্ভ করেছেন। জানি না কোত্থেকে শুরু করেছেন, কোথায় শেষ করেছেন, কিংবা আদৌ শেষ করেছেন কি না। দেশকালের প্রেক্ষাপটে 'বিচিত্রা'র পঁচিশ বছরের ইতিহাস এত বৈচিত্র্যপূর্ণ, এত সংঘাত ও চমকপ্রদ যে, মনে হয় না লিখে কখনও শেষ করা যাবে।

# স্মৃতি অম্লান

## সেলিনা হোসেন

শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে আমার স্মৃতি তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা অফিসে, শেষ দেখা হয় আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা অফিসে। ১৯৬৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় এসেছি। ষাটের দশকের একদম শেষ পর্যায়ের ঢাকা আমার কাছে অচেনা শহর এবং একই সঙ্গে বন্ধুহীন। লেখালেখির সূচনা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে। ঢাকায় আসার পরও লেখালেখির পোকা মাথা থেকে নামেনি। অচেনা বন্ধুহীন শহরে ঠাঁই করতে হবে এমন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে লেখাকে আঁকড়ে ধরি।

সে সময়ে সাপ্তাহিক 'ললনা' বেশ নাম করেছে। পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ আখতার। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আলবদর বাহিনীর বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশায় শহীদ হন মুহম্মদ আখতার। পত্রিকাটির সাহসী প্রকাশনা, লেখার গুণগত মান এবং পত্রিকার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা আখতার ভাইয়ের শহীদ হওয়ার পেছনে কাজ করেছিল নিঃসন্দেহে। যা হোক, একদিন একটি গল্প নিয়ে 'ললনা' অফিসে সম্পাদকের দপ্তরে হাজির হই। সেগুনবাগিচায় অফিস। পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক জিনিয়া হোসেন। তাদের মূল বাড়ির সামনে ছোট কয়েকটা ঘরে পত্রিকা অফিস করা হয়েছিল। বয়সে তরুণ এবং নতুন লিখিয়ে আমি- ভীষণ ভয় ছিল বুকের ভেতর। কিন্তু সেদিন আখতার ভাইয়ের টেবিলের সামনে বসে কথা বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ভয় কেটে যায়। মুহম্মদ আখতার সেদিন অন্য যার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন শাহাদত চৌধুরী। তিনি তখন 'ললনা' পত্রিকায় সাংবাদিকতা করছেন। পরে জেনেছিলাম ওই পত্রিকাতেই তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরু হয়েছিল। সেদিন তিনি বলেছিলেন, গল্প লেখেন? বললাম, চেষ্টা করি। এখনো হয়ে ওঠে না। হো হো করে হেসে বললেন, এটা কি সরল স্বীকারোক্তি না বিনয়।

> 'হাঙর নদী গ্রেনেড' প্রথম বিচিত্রায় ছাপা হয় নববর্ষ সংখ্যায়। এবারও তিনি আমার মানসিক সংকটকে একদম মুছে দিলেন এভাবে। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।পরের বছরের ঈদসংখ্যা বিচিত্রায় আমার উপন্যাস 'পদশব্দ' ছাপা হয়। উপন্যাসটি পাঠকের দৃষ্টি কেড়েছিল।

আমি উত্তর দেই না। আমার সামনে চ্যালেঞ্জ। কি হবে তার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং বেশি কথার মধ্যে না যাওয়াই ভালো। ফেরার সময় দুজনেই বললেন, আবার আসবেন।

একমুহূর্ত দ্বিধা করে বলেছিলাম, গল্পটি ছাপা হলে আমার পথ খোলা হয়। নইলে কোন মুখে আসি।

শাহাদত চৌধুরী গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, এতো অল্পে ঘাবড়ে যাবেন না।

গল্পটি ছাপা হবে এমন একটি আশা নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য গেটের সামনে এসে দাঁড়ালে নিরিবিলি সেগুনবাগিচার চমৎকার সবুজ মনোরম পরিবেশে হাঁটতে হাঁটতে খানিকটুকু এসে একটা রিকশায় উঠি। মনে মনে বলি, শাহাদত ভাই ঘাবড়ে যাবো বলে এ পথে আসিনি। শেষ চেষ্টা তো অবশ্যই করে যাবো।

আমার গল্পটি ললনায় ছাপা হয়েছিল। বাসায় পত্রিকা রাখতাম। একদিন পত্রিকার পৃষ্ঠায় নিজের গল্পটি দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। গল্পটি আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি' সংকলনে ছাপা হয়েছিল। গল্প ছাপানোর পরে নানা ছোটখাটো লেখা নিয়ে ললনা অফিসে যাই। চমৎকার কলাম লেখার মতো বিচিত্র বিষয় নিয়ে ছোটখাটো লেখা। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় দেশের রাজনৈতিক বিষয়েও লিখতে শুরু করি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলাম। সে সময়ের পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লেখার অনেক উপাদান ছিল। আমার লেখাগুলো ছাপা হওয়াতে আমার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। একদিন শাহাদত ভাই বললেন, আমরা ঠিক করেছি আপনার এ ধরনের লেখাগুলোতে একটি নামের

অধীনে ছাপবো। আপনি একটি নাম ঠিক করুন।

আমি তো আনন্দে আত্মহারা। মহা উৎসাহে 'সংবর্ত' নামটি ঠিক করি। নামটি অনুমোদিত হয়। আমি নিয়মিত লেখি। একদিন শাহাদত ভাই বললেন, দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার এই লেখাগুলো আমাদের সম্পাদকীয় লেখার প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দেয়।

আখতার ভাই এবং তিনি এভাবে আমার অচেনা শহরের ধারণাটা একদম ঘুচিয়ে দেন। আমার ভয় কেটে যায়। আমি আত্মবিশ্বাসী হতে শিখি। একজন লেখককে প্রকৃত পথ দেখানোর এই উদার মানসিকতা সেদিন পেয়েছিলাম বলে আজও এ পথে টিকে আছি। এটি স্বীকার করতে পেরে শাহাদত ভাইয়ের স্মৃতি আমার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় সমৃদ্ধ করে। সেদিন এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিল্পী হাশেম খান। তিনি গল্প-কবিতার ইলাস্ট্রেশন করতেন। আমার প্রথম গল্পটির ইলাস্ট্রেশন তিনি করেছিলেন। এঁদের সবাইকে নিয়ে লেখালেখির যাত্রা শুরু আমার ঢাকা শহরের খোলা দরজা দেখার সূচনা। আমি এ শহরের পথগুলো হেঁটে হেঁটে চিনতে শিখেছিলাম। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ 'ললনা' পত্রিকার প্রকাশনা আপাতত বন্ধ হয়ে যায়। সে সংখ্যাতেও আমার 'সংবর্ত' ছাপা হয়েছিল।

শাহাদত ভাই '৭২ সালে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাঁর অসীম সাহসের খবর পাচ্ছি। ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার খালেদ মোশাররফ বীর উত্তমের অন্যতম সহযোগী। সাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঢাকায় গেরিলা অপারেশনের সক্রিয় কর্মী। মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যগাথা জানানোর জন্য 'লড়াই' নামে পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' পড়ে তাঁর সাহসিকতার আরো খুঁটিনাটি বিবরণ জানতে পেরেছিলাম। স্বাধীনতার পরে মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত চৌধুরী আমার কাছে অন্য আর এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হন। জাহানারা আপার বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। বললাম, নতুন পত্রিকায় জয়েন করেছি লিখবেন। আখতার ভাই শহীদ হয়েছেন, এ কষ্ট ভুলবার নয়। আখতার ভাই প্রসঙ্গে বিষণ্ন হয়ে যাই।

যাহোক, ততদিনে আমি বাংলা একাডেমীতে চাকরিতে যোগদান করেছি। গবেষণা সহকারী পদে। স্বাধীনতার পরে বাংলা একাডেমীতে কয়েকটি নতুন পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরাধিকার' সম্পাদনার দায়িত্ব পান কবি রফিক আজাদ। রশীদ হায়দার, তপন চক্রবর্তী এবং আমি এক রুমে বসতাম। একদিন রফিক আজাদ বললেন, 'উত্তরাধিকার'-এর জন্য একটি ছোট উপন্যাস দরকার। বাইরের কাউকে বলার সময় নেই। আপনি লিখে ফেলুন।

আমার মাথায় তখন 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাস লেখার ছক। আমি কবির তাড়নায় ছোট আকারে উপন্যাসটি লিখলাম। কম্পোজ, প্রুফ দেখা শেষ। প্রিন্ট অর্ডার হয়েছে। ছাপাও শেষ। তখন তৎকালীন মহাপরিচালক বিষয়টি জানতে পারেন। তিনি রফিক আজাদকে ডেকে বললেন, এ লেখা যাবে না। বন্ধ করুন। যে কয় ফর্মা ছাপা হয়েছে তা বাতিল করুন। রফিক আজাদ তাই করলেন। সবাই জেনেছিলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আক্রোশে তিনি এ কাজটি করেছিলেন।

আমি ছাপানো ফর্মাগুলো নিয়ে 'বিচিত্রা' অফিসে শাহাদত ভাইয়ের কাছে যাই। এর আগে বিচিত্রায় আমার একটি গল্প ছাপা হয়েছিল। শাহাদত ভাই সবকিছু শুনে বললেন, ঠিক আছে আপনার উপন্যাস আমি ছেপে দেবো। 'হাঙর নদী গ্রেনেড' প্রথম বিচিত্রায় ছাপা হয় নববর্ষ সংখ্যায়। এবারও তিনি আমার মানসিক সংকটকে একদম মুছে দিলেন এভাবে। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। পরের বছরের ঈদসংখ্যা বিচিত্রায় আমার উপন্যাস 'পদশব্দ' ছাপা হয়। উপন্যাসটি পাঠকের দৃষ্টি কেড়েছিল। এভাবে তিনি আমার যাত্রা অনেকখানি এগিয়ে দেন। উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যে লেখকের জন্য কত প্রয়োজন নিজের জীবন দিয়ে তা উপলব্ধি করি।

বাংলা একাডেমীর নানা কাজে জড়িত থাকার কারণে পত্রিকা অফিসে আমার প্রায়ই যাওয়া হতো না। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন সরকার এ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। ১৯৯৮ সালে মিডিয়া ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনায় ও তাঁর সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক ২০০০' ও 'পাক্ষিক আনন্দধারা' প্রকাশিত হয়। আবার একটি নতুন পত্রিকার যাত্রা শুরু। আবারও তাঁর পত্রিকা থেকে লেখার তাগাদা। তিনি ছোটদের নিয়ে নেসলে গল্প লেখার আয়োজন করেন। সেই সূত্রে ছোটদের গল্প লেখার বিচারক হই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে যাই। শাহাদত ভাই তেমনি আছেন। চুপচাপ, কম কথার মানুষ -আমি তাঁকে যেমন দেখেছি ষাটের দশকের শেষ দু'বছরের দিকে।

তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় 'সাপ্তাহিক ২০০০' পত্রিকা অফিসে। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল সম্ভবত বছর তিন-চার আগে। শুনেছিলাম তিনি অসুস্থতায় ভুগছেন। সেদিন তাঁকে মনে হয়েছিল খানিকটুকু ক্লান্ত, খানিকটুকু বিষণ্ন। মৃত্যুর খবর জানতে পাই সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার অফিস থেকে। না, তাঁকে পুনরায় শেষ দেখার সাহস আমার আর হয়নি। আমি শহীদ মিনারে যাওয়ার ইচ্ছে নিয়েও আবার পিছিয়ে দেখেছি। নিজেকে কখনো কখনো কোনো তাড়না থেকে মুক্ত করা কঠিন হয়।

বাঙালির এই চরম দুঃসময়ে একজন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা তাঁর বুকভরা বেদনা নিয়ে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়েছেন। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন। স্বাধীন দেশের সাংবাদিকতার জগতে সাপ্তাহিক পত্রিকার রুচি, মননশীলতা, আধুনিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে একজন যোগ্য মানুষের মর্যাদায় নিজের অবদান রেখেছেন।

চট্টগ্রাম ও গাজীপুরে আত্মঘাতী বোমা হামলার দিনে তিনি প্রিয় স্বদেশকে দেখেছিলেন আবার মহান একাত্তরের পটভূমিতে। তখন তাঁদের হাতে ছিল বোমা। দেশের যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন তাঁরা। গেরিলা অপারেশনে প্রকম্পিত করেছিলেন পাকিস্তানের আধুনিক সেনাবাহিনীর হৃৎপিন্ড। এখন দেশে আবার স্বাধীনতাবিরোধী চক্র মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মানুষ তাঁদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখছে আবার একটি লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তিনি রুচিশীল, মননশীল সাপ্তাহিক পত্রিকার যে ক্ষেত্রটি তৈরি করেছিলেন সে ক্ষেত্রটিও মৌলবাদী উত্থানে সংকটের মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছে। শাহাদত ভাইকে কেন্দ্র করে স্মৃতির দিনগুলো এভাবে শেষ হবে ভাবিনি। আমাদের দায়, আমাদের ব্যর্থতার ছবি এমনি করুণ। যিনি চলে গেলেন তিনি বেঁচে গেলেন, এমন ভাবনা অন্যায়। তিনি যেটুকু ভালো রেখে গেলেন সেটা আমাদের জীবনে অর্থবহ থাকবে কি না সেটা ভাবাই জরুরি। শাহাদত চৌধুরীর স্মৃতি আমাদের এই ভাবনাকেই জাগিয়ে রাখুক। তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।


**প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ**
**সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ**

ত্রৈমাসিক
**প্রজন্ম একাত্তর**

দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

**১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন**

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

**যোগাযোগ :**
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se

**ঢাকা ব্যুরো :**
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court, Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9565340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: probashiprokashona@yahoo.com

# প্রথম পদক্ষেপটি তাঁর

## মঈনুল আহসান সাবের

রবীন্দ্রনাথের এ রকম এক আকুতি আমরা তাঁর কবিতায় লক্ষ করি- 'আজি হতে শতবর্ষ পরে...।' ওনার খুব জানার ইচ্ছে হয়েছিল, কিছুটা বিস্ময় এং খুব ক্ষীণ সন্দেহ বোধহয় মিশে ছিল ঐ কবিতায়- এই যে তিনি এখন লিখছেন- শতবর্ষ পরে তার কবিতা কেউ পড়বে... পড়বে নিশ্চয়... পড়লে কী হবে পাঠকের অনুভূতি। যারা সৃজনশীল জগতের মানুষ, তাদের ভেতর এই আকুতি কাজ করে। পত্রিকা সম্পাদনা, কিংবা আরো নির্দিষ্ট করে বললে 'সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা' বিশেষ করে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার, সৃজনশীলতার পর্যায়েই পড়ে। ছবি আঁকতেন, গল্প লিখতেন, সংগঠন করতেন, তারপর আপাদমস্তক সম্পাদক- সুতরাং শাহাদত চৌধুরী যথার্থই সৃজনশীল মানুষ। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বিচিত্রা '৯৭-এ এসে সরকারি সৃজনশীলতায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত, এই মানুষটিকে আমার কাজ থেকে দেখার সুযোগ হয়। শাহাদত চৌধুরীর মধ্যে ঐ আকুতি আমি লক্ষ করিনি- 'আজি হতে শতবর্ষ পরে...'। তবে এও আমি নিশ্চিত করে জানি, না থাক তাঁর আকুতি, আজ থেকে শতবর্ষ পরে কেউ যদি ৭৫-৯০ বছর আগেকার বাংলাদেশ নিয়ে গবেষণা করতে হয়, যে কোনো ক্ষেত্রের অবস্থা তার যদি পর্যবেক্ষণের ইচ্ছা জাগে, সদ্য স্বাধীন একটি দেশের মানুষের মনোজগৎ কীভাবে বদলে যাচ্ছিল- এ যদি কারো জানতে ইচ্ছে করে, তাকে অবশ্যই সাপ্তাহিক বিচিত্রার কাছে যেতে হবে। এক সময়ের অতি জনপ্রিয় পত্রিকা আবার বহু বহু সময় পর 'বাংলাদেশ গবেষণা'র কাজেও লাগবে, এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি একজন সম্পাদকের কাছে আর কী হতে পারে?

শাহাদত ভাইকে আমি চিনি স্কুল জীবন থেকে। তার ভাগ্নে আমার সহপাঠী, সেই সুবাদে। তবে সে সময় কখনো কথা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। হলেও সেটি সৌজন্য বিনিময়ের মধ্যে সীমিত থেকেছে। তার সঙ্গে আমার পরিচয় চাকরি সূত্রে। আমি তখন 'নিপুণ' পত্রিকায় চাকরি করি। কবি ইরাজ আহমেদের মাধ্যমে শাহরিয়ার কবির আমাকে ডেকে পাঠালেন। সরাসরি জানতে চাইলেন আমি বিচিত্রায় কাজ করবো কি না। বললেন- 'যেখানে আছ, তার চেয়ে বেতন হয়তো আপাতত কম হবে, কিন্তু এটা নিশ্চয় বেটার অফার।' সে কথা কি শাহরিয়ার ভাইয়ের বলার প্রয়োজন ছিল? বহু আগেই ঠিক হয়ে গেছে, সরকারি বা ধরা-বাঁধা চাকরি আমার জন্য নয়। পারি, না পারি- আমার জন্য ঐ সাংবাদিকতা আর সম্পাদনাই। আর বিচিত্রার চাকরি তখন স্বপ্নের চেয়েও আরো কিছু রঙিন। শাহরিয়ার ভাই বললেন, যাও, শাচৌর সঙ্গে দেখা করো।

> আড্ডায় ছিলেন প্রাণবন্ত। বিশাল বিচিত্রায় যেমন কাজ হতো, তেমন হতো শাহাদত ভাইয়ের রুমে আড্ডা। এ সময়ে বয়সের কোনো ব্যবধান থাকতো না। তিনিই কী অবলীলায় সেটি ভেঙে দিতেন যে আড্ডায় শাহাদত ভাইয়ের পাশাপাশি ২৪-২৫ বছর বয়সী কারো উপস্থিতিতে কোনো প্রসঙ্গের অবতারণাই অস্বাভাবিক লাগতো না।

শাচৌর দরোজায় নক। ভেতরে তখন শাচৌর সঙ্গে কাজী জাওয়াদ ভাই বসা। নিজের পরিচয় দেয়ার পর সামান্য হাসি দেখলাম তার মুখে। তারপরই বসতে বলে জানতে চাওয়া 'পড়ালেখা শেষ করেছে?' 'জি'। 'সার্টিফিকেট দেখাতে পারবে'? 'পারবো। তবে তুলতে হবে।' 'বিষয় কি ছিল?' আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি এবং আসল পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি তার পত্রিকায় একজন 'সহ-সম্পাদককে নেবেন, যার কাজ হবে বিচিত্রায় যারা নিয়মিত কাজ করছেন, এবং বাইরে থেকে যেসব লেখা আসবে, সেসব সম্পাদনা করা এবং প্রয়োজনে প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলা, বাড়তি কিছু যোগ করতে বলা এবং আরো অনেক কিছু- তাকে নিশ্চয় প্রচুর যাচাই করে নেবেন, দীর্ঘ সময় ধরে। এটা, ওটা, হাজারটা প্রশ্ন করবেন। শাচৌ মোটেও এই প্রচলিত পথে হাঁটলেন না। তিনি টেবিলের ওপর থেকে বিচিত্রার বর্তমান সংখ্যা (যেটা তখন বাজারে) তুলে এগিয়ে দিয়ে বললেন- তুমি এই সংখ্যার সম্পাদকীয় পাতা থেকে শেষ পর্যন্ত এডিট করে কাল নিয়ে আসবে।

এ রকম কিছু ঘটবে আমার ধারণা ছিল না। সম্পাদনার পর যে সংখ্যাটি বাজারে গেছে সেটার ওপর কলম চালিয়ে আমার দক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে? সে রকম এক প্রমাণ দিয়েই আমি পরদিন বিচিত্রায় যোগ দিয়েছিলাম। তবে এই প্রসঙ্গের অবতারণা শাহাদত ভাইয়ের অভিনব কৌশলের প্রয়োগের কারণে। তার মস্তিষ্ক কতোটা উদ্ভাবনা ছিল, সেটা বোঝানোর জন্য। আমি আজও মনে করি ঐ ক্ষেত্রে কাউকে যাচাই করার জন্য সবচেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।

এই মানুষটা ছিলেন প্রকৃত মেধাবী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, দেখার চোখও ছিল পরিষ্কার, তার নিজের কোনো সীমাবদ্ধতা থাকলে সেটা প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না তার। প্রশাসক হিসেবেও ছিলেন অন্যন্য। একটি বড় ঘরে আমরা বসতাম, সেটি পার হয়ে তাকে তার রুমে ঢুকতে হতো। এখনো এই দৃশ্যটা আমি দেখতে পাই- মুখে স্মিত হাসি নিয়ে তিনি আমাদের রুমে ঢুকছেন। জায়গাটুকু পার হয়ে যেতে যেতে তিনি সবার দিকে এক কিংবা আধা পলকের

জন্য তাকিয়ে নিতেন। আমি কিছুদিন পর টের পেয়েছিলাম, ঐ এক পলকের মধ্যেই সবাইকে দেখে নিতেন তিনি। ঘরের অবস্থা, কে কী করছে, কার টেবিলের সামনে কে, কে কাজে কে গল্পে- এমনকি আমার ধারণা- কারো শার্টে যদি একটি অন্য রঙের বোতাম থাকতো, সেটাও তাঁর চোখ এড়াত না। কি সাংবাদিক, কি সম্পাদক (পত্রিকা প্রধান অর্থে) এই দেখার চোখটি থাকা জরুরি। স্বীকার করতে আমার এতোটুকু দ্বিধা নেই, তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি। দেখার চোখকে কী করে বড় করতে হয়, সেটি শিখেছি, চারপাশের পরিবেশ আর পরিস্থিতি কীভাবে বদলাচ্ছে সেটি শিখেছি, একটি প্রচ্ছদ কাহিনী কিংবা প্রতিবেদনকে কতোটা নির্মেদ হতে হয়, সেটি শিখেছি এবং আরো অনেক কিছু।

আড্ডায় ছিলেন অসাধারণ এক প্রাণবন্ত মানুষ। বিশাল এক ঝুড়ি ছিল তার, বিশাল। বিচিত্রায় যেমন কাজ হতো, তেমন হতো শাহাদত ভাইয়ের রুমে আড্ডা। এ সময়ে বয়সের কোনো ব্যবধান থাকতো না। তিনিই কী অবলীলায় সেটি ভেঙে দিতেন যে আড্ডায় শাহাদত ভাইয়ের পাশাপাশি ২৪-২৫ বছর বয়সী কারো উপস্থিতিতে কোনো প্রসঙ্গের অবতারণাই অস্বাভাবিক লাগতো না। তিনি আড্ডায় বসে তার ঐ বিশাল ঝুড়ি, নানা অভিজ্ঞতা ও গল্পে ভরা, খুলে বসতেন, আমরা যত না অংশ নিতাম, তার চেয়ে অনেক বেশি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম।

বিচিত্রায় আমাদের প্রায় সব কাজই থাকতো গোছানো। দৈনিক পত্রিকায় প্রতিদিন মিটিং হয়। আমরা সাপ্তাহিক পত্রিকা হয়েও প্রায় প্রতিদিনই ছোটখাটো মিটিং করতাম। প্রতি সপ্তাহে একবার আরো বেশি সময় নিয়ে মিটিং হতো এবং মাসে একটা মিটিং ছিল যথার্থই দীর্ঘস্থায়ী। সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলে দেয়া হতো- ঐ দিন কী কী বিষয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী ও প্রতিবেদন হতে পারে, তার একটি তালিকা সঙ্গে আনতে। তিনি নিজেও আনতেন অসংখ্য বিষয়। পরে সেসব থেকে যাচাই বাছাই করে (দেখা যেত শাহাদত ভাইয়ের মনোনীত বিষয়ই সংখ্যার দিক দিকে এগিয়ে আছে। এখানে 'সম্পাদক সাহেব'কে খুশি করার কোনো ব্যাপার ছিল না। আসলে তিনি এমন সব বিষয় তুলে আনতেন, সেসব এড়িয়ে যাওয়ার বা অপছন্দ হওয়ার কোনো কারণ থাকতো না।) আমরা পরবর্তী কয়েক মাসের প্রচ্ছদকাহিনী ও মূল প্রতিবেদনের বিষয় ঠিক করে নিতাম। মাঝে মাঝে অবস্থার কারণে নতুন প্রচ্ছদ কাহিনী চলে আসতো। দেখা যেত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটাও শাহাদত চৌধুরীর ব্রেইন চাইল্ড। তিনি বলতেন- 'এখন এই স্টোরিটাই হওয়া উচিত।' হতো, দেখা যেত শাহাদত ভাই একদম ঠিক কাজটি করেছেন। কেউ কেউ

*আড্ডায় তিনি থাকতেন সকলের মধ্যমণি*

বলতে পারেন, একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বেশ কয়েকজনের সম্মিলিত প্রয়াস। কিন্তু আমি সব ক্রেডিট শাহাদত ভাইকেই দিয়ে যাচ্ছি। এ কথা ঠিক যে, অধিকাংশ সময়ই শাহাদত ভাই দক্ষ, অতি দক্ষ কিছু হাতের সহযোগিতা পেয়েছেন। বিচিত্রায় ছিল প্রতিভার ছড়াছড়ি, এটা বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। তবে সব কথার পরের কথা, মূল কথা- শাহাদত চৌধুরী ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী। পরিকল্পনা ও নির্মাণের মূল কাজটি তার হাতেই সম্পন্ন হতো।

দারুণ আড্ডাবাজ ছিলেন তিনি। রসিকও ছিলেন প্রচন্ড। প্রশাসক হিসেবে দক্ষ ছিলেন তাও বলা হয়েছে। কাজ কীভাবে আদায় করে নিতে হয় তা তিনি জানতেন। তবে তাকে রাগ করতে খুব কমই দেখেছি। মনঃক্ষুণ্ন হতেন, গম্ভীর হয়ে থাকতেন, শীতল ব্যবহার করতেন, তবে রাগ করে চেঁচিয়ে উঠেছেন, ধমকাচ্ছেন, এমনটা দেখেছি খুবই কম। বরং অধিকাংশ সহকর্মীর প্রতি তার অদ্ভুত আন্তরিকতা ছিল। কারো প্রয়োজনে তাকে অফিসের নিয়মের বাইরে বাড়তি সুবিধা দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করতেন না। আবার সহকর্মীদের আগলে রাখার ব্যাপারটাও তার মধ্যে ছিল পুরোমাত্রায়। আমার নিজের একটা উদাহরণ দেই। আলমগীর রহমান চলে যাওয়ার পর বাড়তি দায়িত্ব হিসাবে আমাকে 'লেখালেখি' ও 'ক্রীড়া' বিভাগ দেখতে হয়। এক সংখ্যায় কবি সিকদার আমিনুল হকের একটি গদ্য ছাপি। সেখানে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে সিকদার আমিনুল হকের একটু নিজস্ব মতামত বা মন্তব্য ছিল। ঐ মন্তব্য জনৈক নাট্যকর্মীকে এতোটাই ক্ষুব্ধ করে তোলে- প্রথমে তিনি টেলিফোনে আমাকে হুমকি দেন এবং দেখে নেবেন বলে জানান। পরে তিনি দেখে নেয়ার কাজটি আরম্ভ করেন। তথ্য সচিব, তথ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েও চিঠি পাঠান এবং যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করেন। এসব করে তিনি যথেষ্ট কামিয়াব হন। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে কড়া ভাষায় কারণ দর্শানোর চিঠি আসে শাহাদত ভাইয়ের কাছে। বিচিত্রা তখন এমনিতেই একটু কোণঠাসা অবস্থায়। এ সময় ওরকম একটা চিঠি যথেষ্ট বিরক্তি ও কিছুটা হলেও ভয়ের কারণ। তিনি কী করবেন বুঝতে পারেন না। আমি তাকে বলি, 'শাহাদত ভাই, আপনি মন্ত্রণালয়ে জানিয়ে দেন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এবং প্রয়োজনে তাই করুন।' শাহাদত ভাই কতক্ষণ আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন- 'তুমি কি পাগল সাবের। তুমি যেটা ছেপেছ, সেটার পাশে আমি দাঁড়াব। একজন নালিশ করলেই মাথা নীচু করে মেনে নেবো।' বলা বাহুল্য, তিনি তা-ই করেছিলেন এবং আমরাই জিতেছিলাম।

শাহাদত চৌধুরীর কথা স্বল্প পরিসরে বলে শেষ করা সম্ভব না। তিনি ছিলেন ট্রেন্ড সেটার। তিনি একদিকে সেলিব্রিটি তৈরি করেছেন, আরেকদিকে তার প্রকাশিত রিপোর্টের সত্যতার কারণে মন্ত্রীর পর্যন্ত চাকরি গেছে। এখন সাংবাদিকতা বহুমাত্রিক ও বহুবিস্তৃত হয়েছে। তবে এ কথা আমি মনে করি, আজ সাংবাদিকতার বিভিন্ন ক্ষেত্রের যে বিকাশ আমরা লক্ষ করি, তার পেছনে শাহাদত চৌধুরীর ভূমিকা কম নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাহাদত চৌধুরী প্রথম পদক্ষেপটি রেখেছিলেন, আজ যারা সেসব ক্ষেত্রে আছেন, তারা পরের পাগুলো ফেলছেন মাত্র। বিচিত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্য প্রচন্ড কষ্টের কারণ হয়েছিল। কিছু অসুখ আগে থেকেই ছিল। নতুন পত্রিকা বের করলেও ঐ ক্ষত মুছে যায়নি। মানসিকভাবেও সম্ভবত কিছুটা অবদমিত হয়েছিলেন। এসব কারণেই কি আরো নানা অসুখ তাঁর শরীরে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করে? অবশ্য এসব আমার ধারণা মাত্র। কারণ সাপ্তাহিক ২০০০-এ যতবার তাঁকে দেখেছি, ততবারই আগের মতো উচ্ছল ও প্রাণবন্ত মনে হয়েছে। একবার শুধু, বারডেমে তখন শয্যাশায়ী তিনি, তাকে বিমর্ষ ও ক্লান্ত মনে হয়েছিল। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। অসুখ যে ঐ মানুষটার সঙ্গে মানানসই ছিল না। আবার, পরে, বড় মেয়ে শাশার বিয়ের দাওয়াত দিতে যখন বাসায় এসেছিলেন, তখন তাকে আবার, উচ্ছল ও আমুদে মনে হয়েছিল। এরপর নানা সময় তার অসুস্থতার খবর পেয়েছি। অন্যের মুখ থেকে খবর নিয়েছি, কিন্তু নিজে তাকে দেখতে যাইনি। তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে ইচ্ছে করতো না, আমার ধারণা তিনিও চাইতেন না তিনি অসুস্থ বলে কেউ তাকে দেখতে যাক। শহীদ মিনারে যখন এনে রাখা হয়েছে শাহাদত ভাইকে, আমি আছি ওখানে, কিন্তু আমার কোনো ইচ্ছা নেই তাঁকে দেখার। দূর থেকেও তো শ্রদ্ধা, ভালোবাসা সবই জানানো যায়। যায় না? আমারও সব রকমই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কীভাবে নিজের অজান্তে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম! কেন গেলাম? শাহাদত ভাইয়ের আসল চেহারা যারা দেখেছে, তাদের কি ঐ চেহারা দেখতে ভালো লাগে!

# আপনি চলে গেলেন, কিন্তু...

## সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

মুক্তিযোদ্ধা-সাংবাদিক নিভৃতচারী বিবেকী ব্যক্তিত্ব শাহাদত চৌধুরী যেন হঠাৎ করেই চলে গেলেন। গত কিছুদিন থেকেই শাহাদত ভাই শারীরিকভাবে ভালো ছিলেন না। শরীর নামের যন্ত্রটির বেশ কিছু যন্ত্রাংশ ঠিক চলছিল না। কিন্তু তাই বলে এমন আকস্মিকভাবে চলে যাওয়া! আমরা সবাই চলে যাব একে একে। শাহাদত ভাইও চলে গেলেন। কিন্তু আর সবার যাওয়া এবং শাহাদত ভাইয়ের চলে যাওয়ার মধ্যে কিছু হেরফের আছে বৈকি অন্তত আমার তাই মনে হয়। মনে হয় অনেকটা যেন অভিমান করেই শাহাদত ভাই চলে গেলেন। এই অভিমানী শাহাদত ভাইকে চিনবে তারা, যারা তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছে। এক সময়ে আমার এমন সৌভাগ্য হয়েছিল। কাজেই তাকে চেনার সুযোগও হয়েছিল। সুতরাং আমার মনে হয় তিনি অভিমান করেই চলে গেলেন। কেন এই অভিমান ?

যে বাংলাদেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে একদিন শাহাদত ভাই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিলেন সেই বাংলাদেশ তার চলে যাওয়ার সময়ে উধাও হতে শুরু করেছিল। না, বাংলাদেশ নামের দেশটি মানচিত্র থেকে উধাও হয়নি, উধাও হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ। অবশ্য এই বাংলাদেশের উধাও হওয়ার সূচনা স্বাধীনতার পরই থেকেই। তবে তার মৃত্যুক্ষণে উধাও মুক্তিযুদ্ধের দেশ বাংলাদেশ যেন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি প্রকট হয়েছিল।

শাহাদত ভাই স্বাধীন বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ হিসেবে গড়ার কাজে বন্দুক ফেলে কলম তুলে নিয়ে সাংবাদিক হয়েছিলেন। যুদ্ধ জয়ের অস্ত্র ছিল বন্দুক; আর মুক্তির লড়াইয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে অস্ত্র হলো সাংবাদিকের কলম। অধুনালুপ্ত 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা' দিয়ে এই কলমযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। এক পর্যায়ে সরকারি পত্রিকা 'বিচিত্রা' সরকারি নির্দেশে বন্ধ হয়ে গেলেও শাহাদত ভাইয়ের যুদ্ধ থেমে যায়নি। 'বিচিত্রা'র লড়াইকে টেনে নিয়ে এসেছিলেন 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এর পাতায়। এই নতুন সাপ্তাহিকের মাধ্যমে শাহাদত ভাইয়ের লড়াই অব্যাহত থাকল। কিন্তু তিনি পরিমন্ডল থেকে যতই লড়াই করেছেন ততই স্বপ্নের বাংলাদেশ উধাও হয়েছে। ব্যর্থতা তার একক নয়, সমগ্র জাতির। শাহাদত ভাইয়ের সাফল্য লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে। মৃত্যুর আগে অচেতন হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াইটি চলমান ছিল। শাহাদত ভাই যখন চলে যান তখন '৭১-এর স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ক্ষমতার অংশীদার। আমরা সারা ইসলামের নামে পরিচালিত জঙ্গিবাদের থাবায় ক্ষতবিক্ষত। এটা তো মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ হতে পারে না। শাহাদত ভাইয়ের অভিমান এখানেই। এমন বাংলাদেশে তার অধিবাস দীর্ঘতর হোক এমন ইচ্ছে বোধ হয় মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত ভাইয়ের হয়নি। কাজেই তিনি অভিমান করে চলে গেলেন।

কিন্তু? কিন্তু আমরা যারা এই ক্ষতবিক্ষত দেশে জীবনের প্রহসন হয়ে এখনও বেঁচে আছি, যারা শাহাদত ভাইয়ের মতো অভিমান করে এখনও চলে যেতে পারেনি তাদের কী হবে? আমাদের এখন বা আগামীতে কী হবে একথা 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এর পাতায় শাহাদত ভাই বলে দিতে পারতেন। পত্রিকাটি এখনও আছে; আমাদের আশা ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু শাহাদত ভাইয়ের দিকনির্দেশনা সমৃদ্ধ বা শাহাদত ভাইয়ের পরিকল্পিত কোনো প্রতিবেদন বা প্রচ্ছদ প্রতিবেদন আর তৈরি হবে না। 'সাপ্তাহিক ২০০০' হয়তো সবকিছু ঠিকঠাক চালিয়ে যাবে। কিন্তু 'সাপ্তাহিক ২০০০' মানেই শাহাদত ভাই তা আর হচ্ছে না। আমাদের কষ্ট সেখানেই। তবুও শাহাদত ভাইয়ের হাতে গড়া এক ঝাঁক উদ্যমী-উৎসাহী-সাহসী তরুণ-তরুণী 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এর হাল ধরে থাক। শাহাদত ভাইয়ের স্মৃতি বেঁচে থাক। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের জন্য 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এর লড়াই চলুক। 'বিচিত্রা' কার্যালয়ে শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার সূচনা হয়েছিল। বিচিত্রা ও শাহাদত ভাইয়ের কাছে আমার অপরিসীম ও অপরিশোধ্য ঋণ। কারণ, মাঝে মধ্যে একাডেমিক লেখার বাইরে সাধারণ পাঠকের উপযোগী কোনো লেখার দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা কোনোটিই আমার ছিল না। 'বিচিত্রা'র পাতায় আমার এমন লেখার হাতেখড়ি আমার দ্রষ্টা ও দিশারী শাহাদত ভাই। সহযোগী ছিলেন অনুজপ্রতিম অন্য এক স্বনামধন্য মুক্তিযোদ্ধা তরুণ শাহরিয়ার কবির। মনে পড়ে '৮৪-র ১২ নবেম্বর বিচিত্রায় প্রকাশিত আমার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন 'বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনরুত্থান'-এর কথা। শাহাদত ভাই ও শাহরিয়ার কবিরের দিকনির্দেশনায় রচিত হয়েছিল প্রতিবেদনটি। প্রতিবেদনটি বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। খুশি হয়েছিলেন শাহাদত ভাই। শাহরিয়ার কবিরও। সেদিন ওই রচনায় যা বলেছিলাম, যে ভবিষ্যৎ শঙ্কার কথা বলেছিলাম তা বর্তমানের ইসলামী জঙ্গিবাদ ও বোমাবাজির মধ্য দিয়ে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। আমার বিশ্বাস মৃত্যুর আগে শাহাদত ভাইও এমন ভেবেছিলেন। বলে রাখি বছরের শুরুতে কোনো পত্রিকার বর্ষপত্র প্রকাশের রীতি শাহাদত ভাই চালু করেছিলেন। আমার দায়িত্ব ছিল বর্ষপত্রের জন্য পররাষ্ট্রনীতির ওপর প্রতিবেদন তৈরি।

মনে পড়ে আড্ডায় আলাপচারিতার সময়ে শাহাদত ভাই অনবরত কাগজ লম্বা করে ছিঁড়তেন। এমন বাতিক দৃষ্টান্তরহিত। আমার কাছে ব্যাপারটি প্রতীকী মনে হতো। মনে হতো তিনি যেন সমাজের যাবতীয় ব্যত্যয়-বিচ্যুতিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে নিশ্চিহ্ন করছেন। শাহাদত ভাই সম্পাদিত পত্রিকা এই বার্তা বহন করতো। শাহাদত ভাই এমন সময় চলে গেলেন যখন এই ভূমিকার বড় বেশি প্রয়োজন ছিল। তাই বলি শাহাদত ভাই আপনি চলে গেলেন, কিন্তু..